যুগান্তর

তারিখ 4 APR 2017
পৃষ্ঠা কলাম

এ কে এম শাহনাওয়াজ

বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন আদৌ হবে কি?

সম্প্রতি মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ডাকসু নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেছেন। দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন হয় না। ছাত্র রাজনীতি অনেক আগে থেকেই এর ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে। নির্বাচিত ছাত্র সংসদ না থাকায় বিভিন্ন দলীয় ছাত্রসংগঠন এখন ক্যাম্পাস দাবড়ে বেড়াচ্ছে। প্রচলিত রাজনৈতিক সংস্কৃতি অনুযায়ী সরকারদলীয় ছাত্রদেরই এখন প্রতাপশালী রাজত্ব। এসব দলীয় ছাত্র প্রকৃতপক্ষে ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করে না। ছাত্রকল্যাণমূলক কোনো কর্মসূচি থাকে না এসব দলীয় ছাত্রের রাজনীতিতে। বরঞ্চ ছাত্রনেতাদের খুশি রেখে হলে সিট পেতে হয়। ক্লাস পরীক্ষার ক্ষতি করে বলপূর্বক মিছিলে যেতে বাধ্য করা হয় ছাত্রদের। চাঁদাবাজি আর সন্ত্রাসের কলঙ্কতিলক এদের কপালে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় উপাচার্য ও প্রশাসনের কাছ থেকে এরা প্রশ্রয় পেয়ে আরও প্রকাণ্ড হয়ে ওঠে।

আমাদের রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা এক জোড়া শব্দ আবিষ্কার করেছেন। তা হচ্ছে 'রাজনৈতিক বক্তব্য'। অনেক বেফাঁস কথাই তারা বলেন। কোনো বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুললে তারা তা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, এসব রাজনৈতিক বক্তব্য, তাই অত সিরিয়াস হওয়ার দরকার নেই। অর্থাৎ ঘোষণা দিয়েই তারা অসত্য বলেন; কিন্তু কেন বলেন আমরা বুঝতে পারি না। একসময় এ দেশে শিক্ষার হার কম ছিল। মানুষের মধ্যে দারিদ্র্যও ছিল বেশি। চিন্তায়-আচরণে পিছিয়ে পড়া মানুষের সংখ্যা ছিল উল্লেখ করার মতো। রাজনৈতিক সচেতনতাও সবার ছিল না। তখন এদের ওপর আছর করতে চাইতেন রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীরা। সে কারণে সুযোগমতো 'রাজনৈতিক বক্তব্য' দিতেন। প্রতারিত মানুষের মন বিগলিত হতো।

এখন সময় পাল্টেছে। ডিজিটাল যুগের মানুষ অনেক কিছুই স্বচ্ছ চোখে দেখতে পায়। পথের পাশে চায়ের দোকানে দাঁড়ালে সাধারণ অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত রিকশাওয়ালাও চলমান রাজনীতির চমৎকার বিশ্লেষণ করেন। কাজেই তাদের সামনে রাজনৈতিক বক্তৃতা দেয়ার পুরনো অভ্যাস ছাড়া উচিত। মানুষ এসব এখন নিন্দার চোখে দেখে। অনেকে বলেন, দলীয় কর্মী-সমর্থকদের চাঙ্গা রাখতে এসব আবোল-তাবোল বলতে হয়, কিন্তু বোঝেন না এরাও এখন ডিজিটাল যুগের মানুষ।

ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে আলোচনায় বসলে চলমান ছাত্র রাজনীতির কথা এসে যায়। ছাত্র রাজনীতি তার উজ্জ্বল অতীত কবর দিয়ে অন্ধকার বলয়ে নিজেকে ছুড়ে দিয়েছে। সব দলের শাসন যুগেই তাদের ছাত্রসংগঠনের আচরণে অতিষ্ঠ হয়ে মানুষ ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা তুলত। আর তখনই রাজনৈতিক বক্তব্য দিতে অভ্যস্ত নেতারা রে রে করে তেড়ে আসতেন। বলতেন, এ বড় অন্যায় দাবি। ছাত্ররা রাজনীতি না করলে দেশ ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক কাণ্ডারি পাবে কোথায়!

আমাদের মনে হয় এ কথাগুলোও রাজনৈতিক বক্তব্য। বিজ্ঞ রাজনীতিকরা ভালো করেই জানেন ছাত্র রাজনীতি বন্ধের কথা কেউ বলছে না— বলছে বর্তমান ধারার ছাত্র রাজনীতি বন্ধ করতে। যে ছাত্রনেতারা গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের প্রতিনিধিত্ব করে না, তাদের দাপট বন্ধের কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি যাদের দায়-দায়িত্ব থাকে না, ছাত্রকল্যাণমূলক কোনো কাজে যাদের দেখা যায় না, যারা শুধু আসুরিক দাপটে চলে, সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নির্দেশ দিতে পছন্দ করে, সন্ত্রাস ও অপকীর্তির সঙ্গে অনেকেই যুক্ত থাকে— এদের হাত থেকে ক্যাম্পাসকে মুক্ত রাখার কথা বলা হয়। এরা যে সবার প্রতিনিধিত্ব করে না, তা তাদের দলীয় স্লোগানেই স্পষ্ট বোঝা যায়। এদের নিয়ে বড় আশা করার সুযোগ কোথায়! ভবিষ্যৎ রাজনীতিক হওয়ার মতো কোনো প্রশিক্ষণ ও চর্চায় এরা থাকে না। বাস্তবতার কারণেই বলতে হয়, এ ধারার রাজনীতি চর্চাকারীরা ভবিষ্যৎ রাজনীতির কাণ্ডারি হলে বরঞ্চ মহাবিপদ।

আমরা অতীতেও দেখেছি এখনও দেখছি, উজ্জ্বল মেধাবী ছাত্রনেতা যারা এখনও রাজনীতির হাল ধরে আছেন, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। সাধারণ ছাত্রদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন দলীয় লেজুড় ছিলেন না। যে কারণে এ ছাত্রনেতারা ভাষা আন্দোলনে রক্ত দিয়েছেন, শিক্ষা আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে পেরেছেন। স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে সামনে দাঁড়িয়ে আন্দোলনকে বেগবান করেছেন।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ছাত্রনেতৃত্ব না দাঁড়ানোয় এখনকার দলীয় তকমাধারী ছাত্রনেতারা শুধু গুরুদের লাঠিয়ালই হচ্ছে। ছাত্র স্বার্থসংশ্লিষ্ট দাবির আন্দোলনে নিজেদের সংশ্লিষ্ট না রেখে সরকারি দলের ছাত্ররা সরকার ও প্রশাসনকে রক্ষার জন্য ছাত্রদের প্রতিপক্ষ হয়ে আন্দোলন দমনে ভূমিকা রাখে। সুতরাং ক্যাম্পাসে সুস্থতা ফিরিয়ে আনার জন্য নির্বাচিত ছাত্র সংসদ ছাড়া বিকল্প নেই। এসব বাস্তবতা সামনে রেখে বহুবার দাবি তোলা হয়েছে; কিন্তু কোনো সরকারই ছাত্র সংসদ নির্বাচনে আগ্রহ দেখায়নি। সব নেতাই জানেন সরকারি দলের ছাত্রনেতা-কর্মীদের যে ইমেজ তাতে নির্বাচনে জয়ী হয়ে আসাটা কঠিন হবে। বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক নির্বাচনে প্রভাব খাটিয়ে জিতে আসার সম্ভাবনা খুব কম। সুতরাং গণতন্ত্র গোল্লায় যাক— বিজয় নিশ্চিত না হলে ছাত্র সংসদ নির্বাচন নয়।

কেউ হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারেন, বিশ্ববিদ্যালয় তো স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান, এখানে ছাত্র সংসদ নির্বাচনে সরকারের মতামত লাগবে কেন? উপাচার্য আর তার প্রশাসনই তো যথেষ্ট। সাধারণ অর্থে হয়তো কথাটি ঠিক; কিন্তু এ স্বায়ত্তশাসিত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বা প্রশাসন কি স্বাধীন? এখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে উপাচার্য হওয়ার বড় যোগ্যতা দলীয় রাজনীতির পরীক্ষিত শিক্ষক নেতা হওয়া। ফলে তেমন উপাচার্যদের পক্ষে সবুজ সংকেত ছাড়া কোনো পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়।

আমার ধারণা, মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ছাত্রদের মধ্যে এসে নিজের বিবেক থেকেই ডাকসু নির্বাচনের কথা বলেছেন। আমি জানি না সরকারের চাওয়াটাকে হিসেবে নিয়ে তিনি কথাটি বলেছিলেন কিনা। তবে একজন মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর যখন কোনো কথা বলেন, তা নির্দেশের মতোই মনে হওয়া উচিত। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনের কর্তাদের কাছ থেকে এ বিষয়ে ক্ষীণকণ্ঠে এক-আধটু শব্দ শুনেছিলাম মাত্র। তারপর সব থিতিয়ে গেছে। অর্থাৎ চাওয়াটি আসতে হবে সরকার ও আওয়ামী লীগের নীতিনির্ধারণী ফোরাম থেকে। আমার মনে হয় না এ শক্তিমানরা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন করে গণতান্ত্রিক আবহাওয়া ছড়িয়ে দেয়ার পরিকল্পনা করবেন। কারণ গণতন্ত্র নয়, দলীয় অবস্থান শক্ত রাখাটাই তাদের কাম্য।

এ পথ যে কত বন্ধুর আমি ২০১৩ সালের অভিজ্ঞতা দিয়ে বলতে পারি। তখন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক আনোয়ার হোসেন। তিনি খুব শান্তিতে দায়িত্ব পালন করতে পারেননি। বিশ্ববিদ্যালয় সমাজের নানা স্খলনের একটি হচ্ছে এর বৈশ্বিক রূপ নষ্ট হয়ে যাওয়া। রাজনীতিকরণ সম্পন্ন হওয়ায় স্বার্থপর ও কূপমণ্ডূক হয়ে পড়েছে বেশি। অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন এসে এখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন, অনেকেরই তা ভালো লাগেনি। তাছাড়া এতে রাজনীতি করা শিক্ষক নেতারা গুরুত্বহীন হয়ে পড়বেন তা তো হতে পারে না।

এসব ঘোলাটে অবস্থার মধ্যেও তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজে হাত দিয়েছিলেন। একদিন উপাচার্য মহোদয় আমার সঙ্গে পরামর্শ করলেন। ছাত্র সংসদ নির্বাচন না হওয়ার ট্রেন্ডটা পাল্টাতে চান। চান জাকসু নির্বাচন করার ব্যবস্থা নিতে। যেহেতু জাকসু নির্বাচন আয়োজন করার এখতিয়ার বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের, তাই তিনি তো উদ্যোগ নিতেই পারেন। তিনি অনুরোধ করলেন আমি যাতে নির্বাচন কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করি। যুক্তি একটাই— আমি যেহেতু শিক্ষক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত নই, তাই সবার কাছে আমার একটি গ্রহণযোগ্যতা থাকবে। এ দায়িত্ব আমি গ্রহণ করলাম। আসলে ইচ্ছে ছিল নির্বাচন না হওয়ার এ বদ্ধ অর্গলটা ভেঙে ফেলার।

আমরা সিডিউল ঘোষণা করলাম। মনোনয়নপত্র জমা হল, বাছাইও শেষ হল। চ্যালেঞ্জ কম ছিল না। ছাত্রদল ক্যাম্পাসে ঢুকতে পারছে না। ছাত্রলীগেরও নানা রকম ফেকড়া আছে। চাপ রয়েছে দলীয় শিক্ষকদেরও। বৈঠক করে একটি সুরাহার পথে নিয়ে এসেছিলাম। বাম সংগঠনগুলো, সাংস্কৃতিক সংগঠনের কর্মীরা এবং সাংবাদিক ছাত্ররা দীর্ঘ অনভ্যাসের কারণে নির্বাচনের স্বচ্ছতা নিয়ে অহেতুক অস্বস্তি প্রকাশ করতে থাকে। ওদের আস্থায় ফিরিয়ে আনতেও কিছু মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। আমরা চেয়েছিলাম কোনো জায়গা থেকে তাপ-চাপ আসার আগেই নির্বাচন সম্পন্ন করে ফেলতে। আমাদের বিশ্বাস ছিল জাকসু নির্বাচন করে ফেলতে পারলে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষগুলোর পক্ষেও নির্বাচন করা সহজ হয়ে যাবে।

শেষ পর্যন্ত আমাদের সব আশা ও শ্রম বিফলে গেল। জানলাম উর্ধ্বতন মহল অখুশি হয়েছে। তাদের সিগন্যাল ছাড়া জাকসু নির্বাচনের আয়োজন কেন! শেষ পর্যন্ত কূলে ভেড়ার আগে আমাদের নির্বাচনী তরী ডুবে গেল।

এ শিক্ষার পর বুঝলাম, ক্ষমতাধর নীতিনির্ধারকরা না চাইলে বিশ্ববিদ্যালয় গণতন্ত্রের পথে হাঁটতে পারবে না। সুতরাং আমরা এখনও নীতিনির্ধারণ করতে পারলাম না বিশ্ববিদ্যালয় ও হলগুলোতে ছাত্র সংসদ করে দিয়ে ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব তৈরি করব, নাকি দলীয় রাজনীতির লাঠিয়ালদের হাতে তুলে দেব ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব।

আমাদের দেশের ক্ষমতাপ্রিয় রাজনৈতিক দলের পরিচালকরা চান যার যার মতো করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে। দেখে মনে হয় ক্ষমতায় যাওয়া বা টিকে থাকার একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বিশ্ববিদ্যালয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা হোক বা না হোক, সুস্থ রাজনীতি চর্চার পরিবেশ তৈরি হোক বা না হোক, দলীয় অঙ্ক না মেলা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হতে পারবে না!

এ বাস্তবতায় সবুজ সংকেত থাকলে মহামান্য রাষ্ট্রপতির আগ্রহ বাস্তবায়নের দিকে যাবে, নয়তো সব ধীরে ধীরে থিতিয়ে পড়বে। কিন্তু রাজনীতি চর্চা না করা আমাদের মতো বোকাসোকা মানুষরা বুঝতে পারি না ক্যাম্পাসকে অন্ধকারে ঠেলে ফেলার দায় থেকে ইতিহাস তাদের রেহাই দেবে কিনা। অথবা দীর্ঘদিনের বন্ধ দরজা খুলে দেয়ার কৃতিত্ব আওয়ামী লীগ সরকার নিয়ে দলের মুখ উজ্জ্বল করতে পারে। আমরা মনে করি, বর্তমানে রাজনীতির মাঠে আওয়ামী লীগের যে শক্ত অবস্থান, এ সুযোগটি শাসক দল নিতে পারে অনায়াসে।

আমাদের দেশের ক্ষমতাপ্রিয় রাজনৈতিক দলের পরিচালকরা চান যার যার মতো করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে। দেখে মনে হয় ক্ষমতায় যাওয়া বা টিকে থাকার একটি অন্যতম প্রধান স্তম্ভ বিশ্ববিদ্যালয়। তাই বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে গণতন্ত্র চর্চা হোক বা না হোক, সুস্থ রাজনীতি চর্চার পরিবেশ তৈরি হোক বা না হোক, দলীয় অঙ্ক না মেলা পর্যন্ত ক্যাম্পাসে ছাত্র সংসদের নির্বাচন হতে পারবে না!

এ কে এম শাহনাওয়াজ : *অধ্যাপক, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়*
shahnawaz7b@gmail.com